খেপা জাদুকর

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

এক

'তুমি কিন্তু, মুসা, পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছ,' টিচাররা ইদানীং কথাটা বারে বারে আওড়াচ্ছেন। আমার শেষ রিপোর্ট কার্ড দেখে বাবা-মাও ঠিক এ কথাটাই বলেছে।

লোকে হয়তো ভাবতে পারে, লেখাপড়ায় মন দিলেই হয়। কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে দেখি এভাবে: বই-পত্র থাকবেই। অঙ্ক, ইতিহাস, বিজ্ঞানও থাকবে বহাল তবিয়তে। কিন্তু টিভিতে খেলা দেখা কিংবা নিজে বাস্কেটবল খেলায় সময়টা চলে গেলে আর পাব না। গত শুক্রবার অবশ্য কোচ বলেছেন, আমাকে আরও ভাল করতে হবে– নইলে বাদ দিয়ে দেবেন দল থেকে। আর বাবা-মা যদি আমার টিভি দেখা বন্ধ করে দেয় তো আমি মোটেও অবাক হব না।

তবে একটা কাজ আমি কখনোই ছাড়ব না। সেটা হচ্ছে ক্যাগজ বিলি করা। আমার আয়ের একমাত্র উৎস। কাজেই কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছাড়ি আমি, গ্রীনহিলসবাসীদের ঘরে ঘরে কাগজ পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্বটা সুষ্ঠুভাবে পালন করি।

আজ সকালে দেখি আমার ক্রেতাদের তালিকায় আরেকটি নাম যোগ হয়েছে। বিল হার্ট। নামটা আগে শুনিনি, তবে ১০০ মেইন স্ট্রীট বেশ পরিচিত শুনিয়েছে আমার কানে। এটাই কি সেই ভুতুড়ে বাড়িটা, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই যেটাকে খালি পড়ে থাকতে দেখছি? কে এল ওখানে?

বাইকে চেপে কাগজ বিলি শুরু করলাম। কিন্তু শেষ বাড়িটার কাছাকাছি হতেই বুক ধুকধুক করতে লাগল। ওই যে, প্রাচীন বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বিষাদের প্রতিমূর্তি সেজে। শেষ কবে রং করা হয়েছে কে জানে। সামনের উঠনে এক ফুট উঁচু হয়ে আগাছা জন্মেছে। ছেলেপিলেরা রাস্তার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা এ বাড়িটাকে হানাবাড়ি ভাবে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। কথাটা এতটাই ছড়িয়েছিল যে, রাশেদ চাচা একবার আমাদেরকে বাড়ির ভিতরটা ঘুরিয়ে নিয়ে গেছেন, ভয় ভাঙানোর জন্য। তাতেও অবশ্য ভয় কাটেনি আমার। সঙ্গে রাশেদ চাচা ছিলেন, তার উপর দিনের আলো– ভূত

দেখা দেবে কেন।

দুরু দুরু বুকে, গোটানো কাগজ ছুঁড়ে দিতে তৈরি হলাম ভাঙাচোরা বারান্দার উপরে। কিন্তু থমকে গেলাম শেষ মুহূর্তে। মান্ধাতা আমলের এক চেয়ারে বসে ধূসর চুলো দাড়িওয়ালা এক লোক। বলে দিতে হলো না ইনিই বিল হার্ট।

'গুড মর্নিং, মুসা,' বললেন তিনি।

আঁতকে উঠলাম। আমার নাম জানেন বলে নয়, কাগজের সাবসক্রিপশন বিভাগ থেকে নামটা জেনে নিতেই পারেন। চমকেছি ওঁর কণ্ঠস্বর শুনে। রক্ত চলকে উঠেছে বুকের মধ্যে। ইচ্ছে করল এখুনি পালাই। কিন্তু মি. হার্টের পরের মন্তব্যটা আমাকে জায়গায় জমিয়ে দিল।

'স্কুলে সমস্যা হচ্ছে, কী, তাই না? লজ্জার কথা। জ্ঞান হচ্ছে শক্তি। কথাটা মনে রেখো।'

এতটাই বিস্মিত হয়ে গেছি মুখে কথা ফুটল না। ইনি জানলেন কী করে পরীক্ষায় আমার ফল কেমন হয়েছে? একটু সুস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করতে যাব, মি. হার্ট উঠে পড়লেন। সদর দরজা খুলে পা রাখলেন ভিতরে। হাতে গোটানো এক খবরের কাগজ। খাইছে! আমি তো এখনও ওঁকে কাগজটা দিইনি! আর দেরি নয়, পাঁই পাঁই করে প্যাডেল মেরে স্কুলে চলে এলাম। স্কুলে এসে এত খুশি আগে কোনওদিন হইনি।

কিন্তু বাকি দিনটা কাটল আরও অদ্ভুতভাবে।

মিসেস রবসন যখন শুনলেন আমি আজও হোমওয়র্ক করিনি তখন সবার সামনে বিদ্রূপ করলেন। কেউ কেউ হেসে উঠল। কান গরম হয়ে গেল আমার। কোনও টিচারের উচিত নয় ক্লাসে এভাবে কাউকে অপমান করা। আর করেনও যদি, ক্লাসের সবার উচিত একতা দেখানো– অপমানিত যাতে আরও কষ্ট না পায়। সত্যি বলতে কী, বাস্কেটবল কোচ ম্যাকমোহন যখন সহজ শট মিস করলে কারও উদ্দেশে ধমকে ওঠেন, আমি কখনোই হাসি না। এরপর ইতিহাস ক্লাস। মি. হবসন কালকে একটা অধ্যায় পড়ে আসতে বলেছিলেন। আজ পরীক্ষা নেবেন। কিন্তু হয়েছে কী, আমি ভুলে বইটা ফেলে যাই লকারে।

পরীক্ষার প্রশ্ন দুটো নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি, এসময় আমার চোখ চলে গেল হলওয়ের দিকে। অন্ধকার কোণে কার যেন ছায়ামূর্তি। ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা, যখন টের পেলাম ওটা বিল হার্ট। ঠায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে

রয়েছেন আমার উদ্দেশে। মুখে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি। উনি ওখানে কী করছেন? শিউরে উঠলাম রীতিমত। ভদ্রলোককে আমি ভয় পেতে শুরু করেছি।

দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। ক্লাসরুম থেকে ছুটে পালাতে মন চাইছে। কার জন্য অপেক্ষা করছেন মি. হার্ট? সত্যি বলতে কী, পরীক্ষার চাইতে ওঁকে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছি আমি। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে না পেরে প্রায় সাদা খাতাই জমা দিলাম। তারপর ডেস্কে ফিরে গিয়ে, বাহু ভাঁজ করে মাথা রাখলাম।

এর কয়েক মিনিট পর। আশ্চর্য কাণ্ড, শুনতে পেলাম মি. হবসন আমার প্রশংসা করছেন। আমার উত্তর নাকি নির্ভুল হয়েছে। কথাটা শুনে চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম আরকী। এবার কেন কে জানে, করিডরের দিকে চকিতে এক ঝলক চাইলাম। ফাঁকা। স্বস্তি বোধ করলাম– যতক্ষণ না কানে প্রতিধ্বনিত হলো অদ্ভুত এক খলখল হাসি। হার্ট, কোনও সন্দেহ নেই। আমার স্থির বিশ্বাস, পরীক্ষার খাতায় ওলটপালটটা সে-ই করেছে। কিন্তু কীভাবে? এবং কেনইবা? ক্লাসের সেরা ছাত্রী, নাক উঁচু লুসি শেরিংহ্যাম আমার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে। বলতে বাধা নেই, ভাল লাগল আমার।

একটু পরে, বেল বেজে উঠল। মাথা থেকে সরিয়ে দিলাম বিল হার্টের চিন্তা।

তবে সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়।

দুই

আমাদের পাশের বাসায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। মলি নামে এক মেয়ে আছে তাদের। আমার বয়সী। সবজান্তা ধরনের। ওর সঙ্গ বিরক্তিকর লাগে আমার।

যা হোক, বাইক চালিয়ে ড্রাইভওয়েতে যেই ঢুকেছি, ওদের দরজা দিয়ে মাথা বের করল মলি। আমার অপেক্ষাতেই ছিল যেন।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করলেই তো।' বাইকটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে ঝটপট সটকে পড়ার ইচ্ছা।

প্রশ্নের জবাব দিতে ভাল লাগে না আমার। তা ছাড়া মলি ঠিক সময়টাও বেছে নেয়নি।

'যা বলার বলে ফেলো,' বললাম। আমার প্রিয় টিভি শো এখুনি শুরু হয়ে যাবে। ওকে অবশ্য সে কথা জানালাম না।

'আচ্ছা, এখানে নাকি একটা ভুতুড়ে বাড়ি আছে?' প্রশ্ন করল ও।

'কে বলেছে?'

'সেদিন কয়েকটা ছেলে-মেয়ে বলাবলি করছিল। আমি অবশ্য ওদের কথা বিশ্বাস করিনি। তবে ওদেরকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল।'

'ভুতুড়ে বাড়ি আবার কী?' খেঁকিয়ে উঠলাম প্রায়। কল্পনায় অবশ্য বিল হার্টের ছবি ঝিলিক দিয়ে গেল। বারান্দায়, হলওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এ মুহূর্তে আমি বিল হার্ট আর মলির কাছ থেকে নিস্তার চাই।

'কী ব্যাপার? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ?'

কথাগুলো ঘাই মারল মাথার মধ্যে।

'আমি খুব ক্লান্ত। খিদেও পেয়েছে। তুমি এসব আজেবাজে চিন্তা মাথা থেকে বাদ দাও তো।'

ঠিক এসময় মা দরজা দিয়ে উঁকি দিল।

'তোরা ভেতরে আয়। কোকো বানিয়েছি।'

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল মলি।

'বিকেলটা আমি তোমাদের বাসায় থাকছি। আমার বোনকে নিয়ে মা ডাক্তারের কাছে গেছে।'

অতিকষ্টে বিরক্তি চাপা দিলাম। আজকেই কিনা মলিকে এসে জুটতে হলো! কোথায় মনটা হালকা করার জন্য টিভি দেখব তা না, এখন ওকে সময় দিতে হবে। কাকে? যে আমাকে আজ সারাদিনের অদ্ভুতুড়ে ঘটনাগুলো নিজের অজান্তেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

কোকোটা যথেষ্ট গরম। একবার ভাবলাম ওটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাই. কিন্তু মা সেটা পছন্দ করবে না। অতিথির সঙ্গে অভদ্রতা করলে কপালে খারাবি আছে। কিন্তু কীসের অতিথি? আমি ওকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছি নাকি?

অগত্যা মলির সঙ্গে বসে থাকতে হলো। ও একঘেয়ে সুরে পড়াশোনার গল্প করে যাচ্ছে। কবে কী গ্রেড পেয়েছে শুনে বুঝলাম মেয়েটি ছাত্রী হিসেবে ভাল। শেষমেশ যখন ভাবছি ওর কথা ফুরিয়েছে, দেখি আমার নোটবইয়ের

দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে আমার ইতিহাসের উত্তরপত্র।

'আমি শুধু নিজের কথা বকে যাচ্ছি, অথচ তুমি এ-প্লাস পেয়ে বসে আছ,' বলল।

মা সিঙ্কে কাপ ধুচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল।

'কীরে, এত ভাল করেছিস কিছু বললি না যে?'

বলিনি কারণ আমি নিজে তো কিছুই করিনি। যা ঘটেছে সেটা ব্যাখ্যা করব কীভাবে? পরীক্ষার জন্য যদি তৈরি হয়েও যেতাম, এত ভাল করতে পারতাম? প্রশ্নই ওঠে না। মা এখন আশা করবে আমি সব পরীক্ষাতেই ভাল করতে থাকব– আমার পক্ষে যেটা অসম্ভব। এই মলি মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। কী দরকার ছিল তোর এত বকবক করার? আর আমিই বা কাগজটা লুকিয়ে রাখলাম না কেন? কাগজটা নষ্ট করে ফেলব আমি, কিন্তু তার আগে উত্তরগুলো পড়ে দেখতে হবে– নিজের ঘরে গিয়ে!

মা আমার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে, সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। হাত বাড়ানো। কাগজটা নোটবই থেকে টেনে বের করেছি, দেখি অপরিচিত অদ্ভুত হস্তাক্ষরে কী সব যেন বিজি বিজি করে লেখা। মা দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে এখন পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রেড সম্পর্কে মন্তব্য করার পর সরু হয়ে এল মায়ের চোখজোড়া।

'"জ্ঞানই শক্তি। বি. এইচ।" ঠিক কথা। কে রে এই বি. এইচ?'

'স্কুলে নতুন এসেছে,' কোনওমতে আওড়ালাম। পুরোপুরি মিথ্যে বলা হলো না।

মলি– মিস নাক গলিয়ে– সাগ্রহে নোটটা দেখছে।

'এটা কী ধরনের হাতের লেখা? দেখে মনে হচ্ছে মধ্য যুগের লোক।'

'মজা করে লিখেছে।' মায়ের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে এক দৌড়ে উপরে, নিজের ঘরে চলে গেলাম। দরজা লাগিয়ে দিয়ে চোখ রাখলাম আয়নায়। মলি ঠিকই বলেছে। আমাকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। দেখাবেই তো, ভয় তো পেয়েছি।

বিছানায় বসলাম। একা হতে পেরে স্বস্তি বোধ করছি। চারদিকে নজর বুলালাম। ঘরের কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই, অথচ আমার কেমন জানি বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে। অস্বাভাবিক এক দিন কাটল আজ। কিশোর আর রবিনও নেই যে ওদের সাথে এ নিয়ে আলাপ করব। উইকএন্ডে হিরন চাচার

বাসায় বেড়াতে গেছে ওরা। এখনও আসেনি। আমি যেতে পারিনি কাগজ দিতে হয় বলে।

দরজায় টোকা পড়তেই চমকে উঠলাম। মা এসেছে।

'তোর শরীর ভাল তো, মুসা?'

'হ্যাঁ, মা। একটু ক্লান্ত শুধু। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।'

'ঠিক আছে। কিছু লাগলে বলিস।'

'আচ্ছা।'

ভয়ানক ক্লান্তি লাগছিল। খানিকক্ষণের মধ্যেই সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন অন্ধকার। নাইট টেবিলে রাখা ঘড়িটা দেখলাম। তিনটে বাজে!

ভীষণ খিদে পেয়েছে। মুখ ধুয়ে নীচে নেমে এলাম।

কাউকে না জাগিয়ে বড় এক বাটি দুধ আর সিরিয়াল নিলাম। খাওয়া সেরে ঠিক করলাম বেরিয়ে পড়ব কাগজ বিলি করতে। একটু আগেভাগেই বেরোতে চাইছি, বিল হার্টকে যদি এড়াতে পারি সেই আশায়।

ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে গিয়ে দেখি আমিই প্রথম। আজ সবার আগে বিল হার্টের বাসায় গেলাম। তার দেখা পেলাম না। বারান্দা লক্ষ্য করে কাগজ ছুঁড়ে দিলাম। ঠিক জায়গায় পড়ল কিনা দেখার জন্য দাঁড়ালাম না। বুক ভরে শ্বাস নিলাম। নিজের চালাকিতে মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। মন বলছে, আজকের দিনটা ভাল কাটবে।

হঠাৎই একটা কথা মাথায় আসতে মনটা দমে গেল। কাল সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হোমওয়ার্ক করার আগেই। আতঙ্ক জেঁকে বসল মনের মধ্যে। ইংরেজি ক্লাসের জন্য সংক্ষিপ্ত রচনা, দশটা অঙ্ক এবং বিজ্ঞান মেলার জন্য প্রজেক্ট তৈরির পরিকল্পনা– কিছুই করা হয়নি। আর এখন গিয়ে যে হোমওয়ার্ক করতে বসব তারও উপায় নেই। এক গাদা কাগজ এখনও বিলি করা বাকি।

অবশেষে স্কুলে পৌঁছলাম। ক্লাসের সবাই একে একে মিসেস রোজের ডেস্কে তাদের লেখা জমা দিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষমেশ এগিয়ে গেলাম টিচারের উদ্দেশে। তাঁকে জানালাম, শরীর খারাপ ছিল বলে রচনা লিখতে পারিনি। আবার একটা অর্ধসত্য ঝাড়তে হলো।

'কী বলছ তুমি,' অবাক কণ্ঠে কাগজের স্তূপের দিকে চাইলেন তিনি। 'তোমার লেখাটাই তো সবার ওপরে।'

খাইছে! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু স্বচক্ষে যা দেখছি তাকে অস্বীকার করি কীভাবে? আমার হাতের লেখায় একটা রচনা সত্যিই রাখা আছে ওখানে। কান গরম হয়ে গেল আমার। মিসেস রোজ হতভম্বের মত আমার দিকে চেয়ে।

'কোনও সমস্যা, মুসা? আমাকে বলতে পারো।'

ত্রস্তপায়ে ডেস্কের দিকে ফিরে চললাম।

'জি না, কোনও সমস্যা নেই। ভুলে যাইনি যে সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। মানে হোমওয়র্কের কথা বলছি আর কী।'

ভাগ্যিস কেউ আমার আবোল তাবোল বকুনি শোনেনি। নিজেকে বড়ই বোকা আর বিভ্রান্ত লাগছে।

এবং ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হলো। অঙ্কের হোমওয়র্ক সারা হয়ে গেছে। সায়েন্স প্রজেক্টের নক্শাও তৈরি। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের পর বাইকে চেপে যখন বাড়ির পথ ধরলাম, মনে হলো কোনও ফেরেশতা বুঝি সাহায্য করছে আমাকে। আর করবে না-ই বা কেন? আমি কি ছেলে হিসেবে খারাপ?

সাইকেল চালাচ্ছি নির্জন এক গলি ধরে। শর্টকাট হয় এপথে এলে। এখানে পৌঁছে গতি বাড়িয়ে দিই আমি। কেননা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটায় কেমন জানি ভয়-ভয় করে।

সামনের চাকায় একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে গেছে। ব্রেক কষলাম। ঝুঁকে পড়ে ওটা সরাতে গেছি, চোখের কোণে লক্ষ করলাম কী যেন নড়ে উঠল একটা গাছের পিছনে। বুকটা ধড়াস করে উঠল লোকটিকে চিনতে পেরে।

'সরি, 'আজকে ভোরে তোমার সাথে দেখা হয়নি। অবশ্য হোমওয়র্ক করতে বেশ সময় লেগে যায়, এমনকী আমারও। যাকগে, তোমার টিচাররা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন?'

ভয় পেয়েছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু হার্টকে সেটা বুঝতে দেওয়া যাবে না। মুখটাকে কঠোর করে বুড়োর চোখে চোখে চাইলাম।

'কে আপনি? কী চান? আমার হোমওয়র্ক করে দিচ্ছেন কেন? গ্রীনহিলসে এত ছেলে-মেয়ে থাকতে আমাকে এত খাতির কীসের?'

খলখল করে চেনা হাসিটা হেসে উঠল বুড়ো। শিউরে উঠলাম।

'আমাদের ঠিকমত পরিচয় হয়নি। তুমি বোধহয় জেনে গেছ আমি বিল হার্ট। তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব পেলে। আর আমি কী চাই সেটা সময়

হলেই জানতে পারবে।'

উধাও হয়ে গেল সে। আমার কপট সাহসও উবে গেল কর্পূরের মত। এতটাই কাঁপছি, বাইকে চড়তে কষ্ট হলো রীতিমত। বাড়ির উদ্দেশে পেডাল মারছি, হার্টের খেপাটে হাসিটা বেজে চলল মাথার মধ্যে- বারে বারে।

তিন

হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে পৌছুলাম। হাঁপানোরই কথা। বাইক রেসে বিশ্ব রেকর্ড করেছি কিনা আজ।

কিশোর আর রবিনের কথা খুব মনে হচ্ছে। ওদের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। হিরন চাচার বাসায় ফোন করলাম।

একবার রিং বাজতেই রিসিভার তুলল কিশোর। ওর 'হ্যালো' শোনামাত্র বুকটা ভরে গেল।

'হাই, কিশোর। আমি মুসা।'

'আরে, কী খবর? কেমন আছ?'

'ভাল। তোমরা?'

'ভাল। রবিন একটু বাইরে গেছে। সব কেমন চলছে ওখানে?'

'এই তো, চলছে আরকী। হাতে সময় আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। কী বলবে বলে ফেলো। মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটেছে।'

এই না হলে বন্ধু। ঠিক ধরে ফেলেছে কিশোর। ওকে হার্ট ও আজগুবী ঘটনাগুলোর কথা খুলে বললাম। একটা শব্দও অবিশ্বাস করল না ও।

'তো তোমার কী মনে হয়?' প্রশ্ন করলাম।

'সাবধানে থেকো। লোকটা পাগল-টাগল হতে পারে। ওকে কাগজ না দিলে হয় না?'

'হাত খরচার ব্যাপারটা ভুলে যেয়ো না।'

'বেবি সিটিং করতে পারো,' প্রস্তাব করল গোয়েন্দাপ্রধান।

পরমুহূর্তে হেসে উঠলাম দু'জনেই। বছরখানেক আগে ম্যাকলিনদের দুই ছেলেকে বেবি সিট করি আমি। তিন আর পাঁচ বছরের বাচ্চা দুটো পুরো বাড়িটাকে তছনছ করে ছেড়েছিল। ওদের পরবর্তী শিকার ছিলাম আমি।

প্রাণের দায়ে কিশোরকে ফোন করি। ও তক্ষুনি চলে আসে। ছেলে দুটোকে ভিডিও দেখতে বসিয়ে দেয় আর আমি সেই ফাঁকে বাড়িটা গোছগাছ করে ফেলি। মিসেস ম্যাকলিন ডেন্টিস্টের কাছ থেকে ফিরে দেখেন বাচ্চারা টিভির সামনে ঘুমাচ্ছে। তিনি মহাখুশি হন দৃশ্যটা দেখে। আমি আর কিশোর দু'জনেই সম্মানী পাই। সত্যি বলতে কী, মিসেস ম্যাকলিনের সুপারিশের জোরেই খবরের কাগজের কাজটা জুটে যায় আমার।

মাকে লন্ড্রিরুম থেকে উপরে উঠে আসতে শুনলাম। কিশোরকে জানালাম, শীঘ্রি আবার কথা হবে।

'হ্যাঁ,' বলল ও। 'ফোন করাতে খুব খুশি হয়েছি। আমার কথাগুলো মনে রেখো। আর কী হলো আমাকে জানিয়ো।'

রিসিভার রেখে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। কিশোরের সঙ্গে কথা বলে মনটা হালকা লাগছে। কিন্তু আমাকে তো হার্টের সঙ্গে ঠিকই বোঝাপড়া করতে হবে। বাবা-মাকে কিছু জানানোর দরকার নেই। পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছি, অথচ জাদুবলে ভাল ফল করছি শুনলে তারা বিশ্বাস করবে না। আমাকে সোজা ধরে নিয়ে যাবে মনোচিকিৎসকের কাছে। না, ব্যাপারটা আমার একারই সামলাতে হবে।

মার গলা শোনা গেল এসময়।

'মুসা, মলি এসেছে তোর কাছে।'

গুঙিয়ে উঠলাম।

'আসছি।'

কী চায় মেয়েটা?

নেমে এসে জানতে পারলাম, অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে হবে মলিকে। ও চায় আমি ওকে বিল্ হার্টের হানাবাড়িতে নিয়ে যাই। ঠিকানাটাও টুকে রেখেছে।

'এই উইকএন্ডে নিয়ে যেতে পারবে?' জানতে চাইল।

আমার দিকে আশা ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে ও। ওকে বলতে যাচ্ছিলাম, গ্রীনহিলসে কোনও ভুতুড়ে বাড়ি নেই, এবং ১০০ মেইন স্ট্রীটের বাড়িটা ঘুরে দেখে এসেছি আমরা, কোনও ভূতের দেখা পাইনি, এবং ওখানে এখন লোক বাস করে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মলি আমার সাক্ষী হতে পারে। হার্ট হয়তো ওকেও ভেলকি দেখাবে। মলি তখন আমার কথা সমর্থন করবে। এভাবে হয়তো বুড়োকে শহর থেকে খেদানো

সম্ভব হবে।

'ঠিক আছে,' বললাম। 'রবিবার, সকাল এগারোটার দিকে এসো।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মলির।

'সত্যি বলছ? অসংখ্য ধন্যবাদ!'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও– আমি মত পরিবর্তনের আগেই। নিজের ঘরে ফিরছি, ভাবলাম কাজটা ঠিক করছি কিনা। হার্ট যদি সত্যি সত্যি কোনও পাগলামি করে বসে? মলির যদি কোনও বিপদ হয় তবে আমি দায়ী হব। কিন্তু ও-ই তো ওখানে যেতে চেয়েছে। আমি তো ওকে সাধিনি। মাঝে মাঝে জীবনে ঝুঁকি নিতে হয়।

কিশোরের পরামর্শটা নেব ঠিক করলাম। বিল হার্টকে কাগজ দেব না। বসকে বলব ১০০ মেইন স্ট্রীটে অন্য কাউকে পাঠাতে।

কিন্তু আমার বস মিসেস ব্র্যাডম্যানের কম্পিউটার ফাইলে বিল হার্ট নামে কোন গ্রাহক নেই।

'ব্লকের শেষ মাথার পোড়ো বাড়িটার কথা বলছ?' জানতে চাইলেন তিনি। 'ওখানে তো কেউ থাকে না।'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় ভুল হয়েছে। সরি।' উনি আর কোনও প্রশ্ন করার আগেই রিসিভার রেখে দিলাম। আমি অবশ্য অতটা অবাক হইনি।

পরদিন সকালে হার্টের বাড়ি বাদে আর সবখানে কাগজ বিলালাম। মনটা খুশি হয়ে গেল। লোকটাকে এড়ানো গেছে। কিন্তু স্কুলে ঘটল আরেক কাণ্ড।

অঙ্কের ক্লাসে যে খাতাটা জমা দিয়েছিলাম সেটা ফেরত দেওয়া হয়েছে। দশটা অঙ্কই নির্ভুল হয়েছে। মোটেই চমকালাম না। এবার মিসেস রবার্টস বোর্ডে একটা অঙ্ক লিখে আমাকে সমাধান করতে বললেন। খাইছে! উনি আমাকে আদর্শ ছাত্র মনে করছেন, নাকি আমার সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ করছেন বুঝতে পারলাম না।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে হেঁটে গেলাম। কী বিপদেই না পড়েছি! চক তুলে নিয়ে গলা খাঁকারি দিলাম, তারপর বেদম কাশতে শুরু করলাম।

'পানি খাবে, মুসা?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস রবার্টস।

ওঁর দিকে তাকানোর সাহস পেলাম না। ফলে আমার অভিনয়টা বিশ্বাসযোগ্য হলো কিনা বুঝলাম না। মাথা ঝাঁকিয়ে এক দৌড়ে বেরিয়ে এলাম ক্লাসরুম ছেড়ে। আরেকজনকে ডাকা হলো সমাধানটা করার জন্য।

প্রচণ্ড টেনশনের পর হলওয়ের শীতল, শান্ত পরিবেশ স্বস্তি দিল আমাকে। একটা ড্রিঙ্ক নিতে পারলে ভাল হয়। কাছের ফাউন্টেনের উদ্দেশে এগিয়ে গেলাম। আশা করছি কমলার ঠাণ্ডা রস পান করতে পারব। ঝুঁকে পড়ে নব ঘোরাতে যাব, কানে এল পরিচিত এক কণ্ঠস্বর। বিল হার্ট।

'তুমি ক্লাসে আমার সাহায্য নিতে পারতে।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম।

'আপনি কী করছেন এখানে?'

'তোমাকে আবার বোর্ডে ডাকা হবে। টিচার জানেন তুমি অভিনয় করেছ। আমরা তিনজনই জানি অঙ্কটা তুমি কষতে পারবে না।'

'সরে যান আমার কাছ থেকে।' হুমকিটা চেষ্টা করেও গলায় ফোটাতে পারলাম না।

'আমাকে তোমার দরকার। নইলে ক্লাসসুদ্ধ ছেলে-মেয়ের সামনে কান কাটা যাবে। তা ছাড়া টিচারও ভাববেন অঙ্কগুলো তুমি অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছ।'

'কিন্তু আমি জানতাম না—' পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ বন্ধ করলাম। ক্লাসরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস রবার্টস।

'তোমার পানি খাওয়া হয়নি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে, গোমড়ামুখে ক্লাসে ফিরে গেলাম।

চার

স্বীকার করতেই হচ্ছে, হার্ট আমার মুখ রক্ষা করেছে। অঙ্কটা করে ক্লাসের সামনে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। মিসেস রবার্টসকেও সন্তুষ্ট করা গেছে। এমনকী ম্যাথ ক্লাব প্রেসিডেন্ট ক্রিস কেয়ার্নস এতটাই প্রভাবিত হয়েছেন, ক্লাস শেষে ক্লাবের পরবর্তী সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এসবের পিছনে হার্টের হাত রয়েছে। কিন্তু কী জাদু খাটাচ্ছে সে এখনও ধরতে পারিনি। আর কেনই বা এসব করছে তা-ই বা কে জানে।

আমাদের ইংরেজি টিচার মিসেস রোজ আমার রচনা পড়ে দারুণ খুশি। সবার সামনে জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বললেন। আপত্তি করার কারণ

নেই। হার্ট কী লিখেছে জানার কৌতূহল আমারও আছে।

চমৎকার ঝরঝরে ভাষায় লেখা রচনাটায় কোনও জ্ঞান গর্ভ কথা নেই। পড়ে মনে হবে কোনও কিশোর ছেলেই লিখেছে। কেউ কেউ তো রচনাটা শুনে হাততালি দিয়ে অভিনন্দনও জানাল।

সায়েন্স ক্লাসে আমার প্রজেক্টের বর্ণনা শুনে ড্যানি মরিসন আমার পার্টনার হতে চাইল। ড্যানি বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র। দু'জনেই আমরা মানব দেহের হৃৎপিণ্ড নিয়ে কাজ করতে চাইছি।

কিন্তু বেচারা কি জানে আমি এই প্রজেক্টের প-ও তৈরি করিনি। এক খেপা জাদুকর তার আশ্চর্য ক্ষমতাবলে সাহায্য করছে আমাকে। কী তার স্বার্থ এখনও জানা হয়নি আমার। আমাকে সঙ্গে নিয়ে পুরস্কার জেতার কথা ভাবলে শেষটায় ঠকতে হবে ড্যানিকে।

শর্টকাট এড়িয়ে খানিকটা দেরি করে বাড়ি পৌঁছালাম। শীঘ্রিই টের পেলাম পুরো ব্যাপারটাই আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরল। মনে হলো হঠাৎ করে বড় অঙ্কের লটারি জিতে গেছে বুঝি। আসলে তা না। মিসেস রোজ আর মিসেস রবার্টস মাকে ফোন করে আমার পড়াশোনায় উন্নতির কথা জানিয়েছেন। তাতেই মার আনন্দ ধরছে না। বাবাকেও ফোন করে জানিয়েছে। বাবা এতটাই খুশি হয়েছে, রাতে বাইরে খেতে নিয়ে গিয়ে সুখবরটা উদ্‌যাপন করতে চায়। হ্যাঁ, এসব ঘটনার উপর আমার কোন হাত থাকছে না।

রাতে রেস্টুরেন্ট থেকে ফিরে নিজের রুমে ঢুকেছি, ক্লজিটের কাছে কিছু একটা কিংবা কেউ একজন গুটিসুটি মেরে রয়েছে দেখতে পেলাম। খাইছে! কম্পিত হাতে আলো জ্বাললাম।

একগাদা ময়লা কাপড় ওখানে জড় করে রেখেছিলাম। নিজেই ভুলে গেছি। নাহ, বিল হার্ট আমাকে পেয়ে বসেছে! ভেবেছিলাম ও-ই বুঝি ঘরের কোণে হাজির হয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে।

শুক্রবার দিনটা খুব স্বাভাবিকভাবে কাটল। ক্লাসে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেনি, কেউ আচমকা মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়নি। মনটা খারাপই হয়ে গেল। আশা করেছিলাম নিশ্চয়ই অদ্ভুত কোনও ঘটনা ঘটবে। রাতে ঘুমানোর সময় ধারণা করলাম, বিল হার্ট সম্ভবত শহর ত্যাগ করেছে।

শনিবার ঘুম ভাঙার পর ঝরঝরে বোধ করলাম। আজ কাগজ দিচ্ছি না। এক ছেলে বাড়তি পয়সা কামানোর জন্য আমার রুটে কাজ করার অনুমতি

চেয়েছিল, আমি আপত্তি করিনি।

বাবা-মা আজ রাতে পার্টিতে যাবে। তাই মা আমাকে গাড়িতে করে ভিডিওর দোকানে নিয়ে গেল ছবি বাছাই করতে।

সন্ধেবেলা পপকর্ন, চিপস আর এক মগ সোডা নিয়ে ছবি দেখতে বসলাম। মনের যা অবস্থা তাতে দুটো ছবির মধ্যে কমেডিটাই আগে দেখব ঠিক করলাম।

ভিসিআর চালু করলাম, কানে এল নানা ধরনের বিচিত্র ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ। সিঁড়ি, ছাদ, দেয়াল– সবখান থেকে শব্দ আসছে। বাবা বলে এর মানে হচ্ছে বাড়িটা "থিতু" হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বাড়িটা তো যথেষ্ট পুরানো। এতদিনেও থিতু হতে পারল না?

ভিসিআরের ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে গা এলিয়ে বসতে চেষ্টা করলাম। ইস, কিশোর আর রবিন থাকলে কী ভালই না হত! তিনজন একসঙ্গে থাকলে ভয়-ডর কোথায় পালাত! রবিবার মলির সঙ্গে দেখা করার কথা। মনটা দমে গেল। কাজটা সেরে ফেলতে হবে ঝটপট। হার্ট মনে হয় শহরে নেই, কাজেই মলির দেখার মত কিছু পাওয়াও যাবে না ও বাড়িতে। বাড়ির বাইরে দিয়ে দ্রুত এক পাক মেরে ফিরে আসতে হবে।

আরে ধুর, সাত-পাঁচ ভাবতে গিয়ে ছবির খেই হারিয়ে ফেলেছি। রিওয়াইন্ড করতে হবে খানিকটা। এসময় শব্দ হলো আবারও। মাথার উপরে ককিয়ে উঠল মেঝের কাঠ। মনে হলো বাড়িতে আমি একা নই, কেউ একজন আছে আমার সঙ্গে।

ঘড়ি দেখলাম। আটটা বাজে। বাবা-মার ফিরতে আরও কয়েক ঘণ্টা দেরি। ধ্যাত্তেরি, এসব নিয়ে মাথা ঘামাব না। খেই হারানো জায়গাটা খুঁজে পেয়ে ছবিতে মন দিলাম।

বাইরে বাতাসের দাপাদাপি। গাছের ডালে ডালে বাড়ি খাচ্ছে খটাখট। হঠাৎই জানালার শার্সিতে আঘাত হানল কী যেন। চমকে উঠলাম। ঘুরে বসে খড়খড়ি তুলে দিলাম। কিন্তু জানালার কাঁচে গাল ঠেকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না।

সহসা আমার শ্বাসের বাষ্প থেকে একটা মুখাবয়ব ফুটে উঠল। জানালার ওপাশ থেকে সরাসরি আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে বিল হার্ট!

পাঁচ

খড়খড়ি হাতড়াতে লাগলাম, মরিয়ার মত নামাতে চাইছি। কাজটা সেরে টিভি অফ করলাম। এটা কমেডি দেখার সময় নয়। পিছনের দরজার সঙ্গে একটা চেয়ার ঠেকনো দিলাম। পুলিশে খবর দেব? লাভ হবে না। ওরা যখন পৌঁছবে হার্ট ততক্ষণে হাওয়া। সামনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার শুরু করব নাকি? নাহ, লোক হাসিয়ে কাজ কী।

এ মুহূর্তে হাতে একটা অস্ত্র-টস্ত্র থাকা উচিত। ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিলাম। বুক এতটাই ধড়ফড় করছে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাও করতে পারছি না।

শব্দটা কীসের? মাথার উপরে এলোমেলো পায়ে হাঁটছে কেউ। কে? হার্ট? না। ও উপরে যাবে কেন? ও তো বাইরে। নির্ঘাত অন্য কেউ ঢুকে বসে আছে।

আমি আত্মরক্ষা করব কী দিয়ে? কিছু খুঁজে না পেয়ে অগত্যা তুলে নিলাম রিমোট কন্ট্রোলটা। আর কিছু না হোক, কষে বাড়ি তো দিতে পারব।

পায়ের শব্দ এখন সিঁড়িতে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে, লুকানোর জায়গা দরকার। বাবার লাউঞ্জ চেয়ারটা কাজে দেবে মনে হলো। কামরার কোনায় রয়েছে ওটা। অনায়াসে গা ঢাকা দেয়া যাবে চেয়ারটার পিছনে। অনাহূত অতিথি আমাকে দেখার আগেই আমি তাকে দেখতে পাব। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে অপেক্ষায় রইলাম।

হঠাৎই টেলিফোনের শব্দে আঁতকে উঠতে হলো। একটানা বেজেই চলেছে। অবশেষে থামল, তবে মাত্র এক মিনিটের জন্য। টেলিফোন যে করেছে তার জরুরী দরকার মনে হচ্ছে। কালকের ট্রিপের ব্যাপারে মলি করল নাকি? কিশোর কিংবা রবিন করেনি তো আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য?

টেলিফোনটা আর গোটা বাড়ি হঠাৎ করেই নিঝুম হয়ে গেল। কানে আসছে কেবল মুষলধারে বৃষ্টি আর বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। আশা করলাম, খারাপ আবহাওয়ার কারণে হার্ট তার হানাবাড়িতে ফিরে যাবে।

পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে, কিন্তু নড়ার সাহস পেলাম না। এই যাহ, বাতি

চলে গেল! পাওয়ার ফেইল করেছে নাকি কেউ ইচ্ছে করে কাজটা করল বুঝতে পারলাম না। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে টিভি অন করার চেষ্টা করলাম। হলো না।

বুকের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমেই জমাট বাঁধছে।

এসময় সদর দরজায় টোকার শব্দ হলো। পরপর তিনবার। উঠে দাঁড়ালাম, পা কাঁপছে। কে এল এই দুর্যোগের মধ্যে? হার্ট না তো? আমার নাম ধরে ডাকছে। না, হার্ট না– অন্য কেউ।

'মুসা, আছ নাকি? আমি মিস্টার ল্যাম্পার্ড।'

মলির বাবা। বাঁচলাম, বাবা!

আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে সদর দরজার কাছে পৌঁছলাম। খুলে দিলাম।

'ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'না, মানে...' কী বলব? এক খেপা জাদুকর আমাকে জ্বালাতন করছিল? নাকি এটা বলব, আশঙ্কা করছি কেউ গোপনে বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে আছে?

'তোমার মা ফোন করেছিলেন। ওঁদের গাড়ি ট্রাবল দিচ্ছে। ফলে রাতে ফিরতে পারছেন না। তুমি রাতটা আমাদের বাসায় থাকবে।'

খুশি মনে রাজি হয়ে গেলাম আমি।

'ফ্ল্যাশলাইটটা নাও। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমার যা যা লাগে নিয়ে এসো। তোমার মা এখানেও ফোন করেছিলেন, কিন্তু সাড়া পাননি। তুমি টেলিফোনের শব্দ পাওনি?'

'আমি বাথরুমে ছিলাম,' অজুহাত দিলাম। একটু পরে দু'একটা কাপড় আর টুথব্রাশ ভরে নিলাম প্লাস্টিকের ব্যাগে। তারপর উড়ে নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। 'আমি তৈরি।'

'জ্যাকেট নিয়ে নাও।'

'আচ্ছা।' কোট ক্লজিট খুলে সামনে যেটা পেলাম নিয়ে নিলাম। কাজ হবে না। এটা মার। দ্বিতীয়বারে ঠিকঠাক জিনিস বেছে নেওয়া গেল। 'এবার যাওয়া যায়।'

মলি আর মিসেস ল্যাম্পার্ড আমাদের জন্য কিচেনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কুকি আর দুধ নিয়ে বসে দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম আমরা। মি. ল্যাম্পার্ড ফোন করে বাবা-মাকে আশ্বস্ত করলেন। আমিও কথা বললাম তাদের সঙ্গে। রবিবার বিকেল নাগাদ ফেরার আশা করছে বাবা-মা।

মিসেস ল্যাম্পার্ড যখন লিভিং রুমে আমার জন্য সোফা বেড তৈরি

করছেন, আমি আর মলি তখন গল্প করতে লাগলাম কিচেনে।

'তোমার রিপোর্টের কদ্দূর? অতিপ্রাকৃত বিষয়ের রিপোর্টটার কথা বলছি।'

'অনেকটা এগিয়েছে। প্রচুর তথ্য জোগাড় করেছি লাইব্রেরি থেকে।' গলা খাদে নামাল ও। 'কাল যাচ্ছ তো আমার সাথে? মেইন স্ট্রীটের হানাবাড়িটায়?'

'নিশ্চয়ই। আবহাওয়া ভাল থাকলে কেন যাব না?' ফিসফিস করে বললাম।

মুখে হাসি ফুটল মলির।

'আমার বন্ধু ও বাড়ির বুড়োটাকে চেনে,' বললাম আমি। 'তার নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে।'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল মলির।

'কীরকম?'

'এই যেমন আচমকা উদয় হওয়া, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এসব আরকী।'

'বলো কী!'

'হ্যাঁ, আরও আছে। আমার বন্ধু হোমওয়র্ক করতে ভুলে গেলে বুড়োটা করে জমা দেয়, অথচ ও টেরও পায় না। যেসব পড়া ও কস্মিনকালেও তৈরি করেনি সেগুলো অনায়াসে পেরে যায়। শুনতে হয়তো ভালই লাগে; কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।'

'তারমানে?'

মেয়েটা বেশ সহজভাবেই কথাগুলো নিচ্ছে।

'আমার বন্ধু তার বাবা-মা, টিচার আর ক্লাসমেটদের চোখে ধুলো দিতে চায় না। আর বুড়োটা নাকি বলেছে, এসব উপকারের বিনিময়ে সময় হলেই সে কিছু একটা দাবি করবে।' বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নিলাম। 'আমি যেটা জানতে চাইছি, তোমার গবেষণায় এধরনের কিছু কি জানতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে তোমার বন্ধু। এরা অনেক কিছু পারে।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'অদৃশ্য হওয়া, হোমওয়র্ক করে দেয়া–'

'আমি আসলে এতক্ষণ আমার কথাই বলছিলাম।'

'সে আমি আগেই বুঝেছি। তোমার পরীক্ষার খাতা দেখে ফেলেছিলাম, মনে নেই? আন্টি যেরকম আশ্চর্য হলেন, যে কেউই বুঝবে তোমার গ্রেডের কী অবস্থা। কিছু মনে করলে না তো আবার?'

'না, না।'

বিছানা তৈরি হয়ে গেছে, খবর দিলেন মিসেস ল্যাম্পার্ড। আমাদেরকে শুতে যেতে বললেন। শুনে খুশি হলাম। ভয়ানক ক্লান্তি লাগছিল।

আধো ঘুমে কানে এল বিল হার্টের ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর।

ছয়

তড়াক করে উঠে বসে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বুড়ো হাজির হয়ে গেছে।

'কেমন আছ, মুসা? তোমার সাথে দেখা হওয়াতে ভাল লাগছে।'

'আমার লাগছে না। এখন আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দিন।'

বিদঘুটে হাসিটা হাসল হার্ট।

'ঘুম? তুমি তো এখানে ঘুমাতে আসনি।'

'কী বলছেন এসব উল্টোপাল্টা?' এবার কামরার চারপাশে নজর বুলালাম। সিংহাসনসদৃশ এক চেয়ারে বসে আমি, মলিদের সোফা বেডে নয়। অন্ধকার, প্রাচীন এক দুর্গে কীভাবে জানি হাজির হয়ে গেছি– বরঞ্চ বলা উচিত মাটির নীচের এক্ কারা কক্ষে। পরনে আমার চিরচেনা পাজামার বদলে হুডওয়ালা বাদামি এক আলখেল্লা। কোমরে সোনার তৈরি ফিতে, পায়ে রাজা-বাদশাদের মত নাগরা জুতো। আমাকে এ অবস্থায় দেখলে কিশোর আর রবিনের চোখ কপালে উঠে যাবে।

'কী হচ্ছে কী এখানে? আমি কোথায়?'

'আমার কামরায়। খুশি হয়েছ নিশ্চয়ই? সম্মানটার কথা ভাবো।'

'সম্মান অন্য কাউকে দেখান। এটা কি গ্রীনহিলস?' চারধারে চোখ বুলিয়ে টেলিফোন খুঁজলাম। হার্টের অগোচরে পুলিশে ফোন করতে পারলে হত।

'প্রশ্নই ওঠে না। আমার মত মহা ক্ষমতাধর মানুষ ওরকম একটা সাধারণ জায়গায় কী করবে?'

লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। মলি ঠিকই বলেছিল।

ভয় পেয়েছি বুঝতে দেওয়া চলবে না।

'আপনি আমার কাছে কী চান ঝটপট বলে ফেলুন।' সাহস জড় করে বললাম।

'অত তাড়া কীসের? তুমি তো কোথাও যাচ্ছ না। তবে এতই যদি কৌতূহল তো শোনো, আমার একজন ছাত্র দরকার। বয়স হচ্ছে, একজন সহকারী পেলে ভাল হয়।'

'বয়স হচ্ছে' কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলেনি। বুড়োকে দেখে মনে হয় অন্তত তিনশো বছর বয়স।

থাক সে সব চিন্তা। আমাকে পালাতে হবে। ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বুলালাম, কিন্তু একটা জানালাও চোখে পড়ল না।

'নিশ্চয়ই জানালা খুঁজছ?'

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। বুড়ো মন পড়তেও জানে নাকি?

হাত দোলাল হার্ট।

'জানালা,' বলে খলখলিয়ে হেসে উঠল উন্মাদের মত।

সটান উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম জানালা দিয়ে। না, আমরা গ্রীনহিলসে নেই। এমনকী নিরেট জমির উপরও নয়। ভেসে রয়েছি মেঘের রাজ্যে।

'যাও না, যত খুশি চেঁচাও, সাহায্য চাও– কেউ শুনবে না। কেউ দেখবে না।' আঙুলের তীক্ষ্ণ ডগা নাড়ল আমার উদ্দেশে। 'সত্যি বলতে কী, তুমি চলে যেতে চাও শুনে আমি কিন্তু বেশ অপমানিত বোধ করছি।'

'না, মানে আমার বাবা-মা দুশ্চিন্তা করবে কিনা। তা ছাড়া স্কুলের এক ছেলে আমার ওপর ভরসা করে বসে আছে। দু'জন মিলে বিজ্ঞান মেলার জন্যে প্রজেক্ট তৈরি করার কথা।'

'তুমি যদি গ্রীনহিলসে ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে নিতে পারো, তবে বলতেই হবে তুমি আমার চাইতেও বড় জাদুকর। হাহ্, হাহ্, হা।' পরমুহূর্তে, বিদ্যুৎ ঝলকের মত উবে গেল বুড়ো।

এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হার মানতে রাজি হলো না মন। নিশ্চয়ই উদ্ধারের কোনও না কোনও রাস্তা আছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, এই বিপদে আমি পড়লাম কীভাবে? খাইছে, একী!

'এই যে, মুসা, এদিকে।' কিশোরের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, এদিকে।' রবিন বলে উঠল।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু মনে হলো ওদের কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে দেয়ালের কাছ থেকে– হার্টের এক পোরট্রেটের পিছন থেকে। ছবিটা যে এঁকেছে তার প্রশংসা করতে পারলাম না। কেননা বুড়ো দেখতে মোটেই অমন সুন্দর নয়।

'কোথায় তোমরা?' প্রশ্ন করলাম মরিয়ার মতন।

'তাড়াতাড়ি করো! সময় নেই। হার্টের ছবিটা নামিয়ে ফেলো। ওটার পিছনে একটা চাবি পাবে,' জবাব দিল কিশোর।

ভারী ছবিটা নামাতে গিয়ে ধুলোয় দম আটকে মরার দশা হলো। দু'হাতে জড়িয়ে গেছে মাকড়সার জাল। কিশোরের কথা মত পুরানো এক চাবি ঠিকই পাওয়া গেল ক্যানভাসের গায়ে। সাঁটিয়ে রেখেছে আঠা দিয়ে। টান মেরে খুলে আনলাম ওটা।

'পেয়েছি,' জানালাম।

'আস্তে কথা বলো,' বলল কিশোর। 'নইলে ওরা শুনে ফেলবে। ওই বুকশেলফগুলো দেখতে পাচ্ছ?'

আগে খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন দেখতে পেলাম এক দিকের পুরো দেয়ালজুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'তিন নম্বর তাকে, বইয়ের পিছনে একটা তালা আছে। চাবিটা ঢুকিয়ে বাঁয়ে মোচড় দাও,' নির্দেশ দিল কিশোর।

ওর কথা মত কাজ করলাম। খাইছে, দেয়ালের একাংশ ধীরে ধীরে খুলে গেল। কিশোর আর রবিন ওপাশে দাঁড়িয়ে।

'তোমাদেরকে পেয়ে কী যে খুশি লাগছে!' বলে উঠলাম।

'আমাদেরও। কিন্তু এখন একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। দরজাটা লাগিয়ে দাও,' জরুরী কণ্ঠে বলল রবিন।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' প্রশ্ন করলাম।

'এই সুরঙ্গ দিয়ে ফিরে যাব পৃথিবীতে,' জানাল কিশোর।

'তুমি এতসব জানলে কীভাবে?' ত্রস্ত পায়ে হাঁটার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। 'তোমরা কতক্ষণ ছিলে এখানে? এই কদিন আগেই না ফোনে কথা হলো?'

'পরে সব শুনো। এখন জলদি চলো,' তাগাদা দিল নথি।

সুরঙ্গটা অন্ধকার আর সেঁতসেঁতে। ভয়-ভয় করছে। বন্ধুদের মনের অবস্থাও সহজেই অনুমান করা যায়। হঠাৎই গমগম করে উঠল একটি

কণ্ঠস্বর।

'চললে কোথায়?'

ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতরটা। আমাদের সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো হার্ট, আপাদমস্তক কুয়াশায় ঢাকা। মুখের চেহারা থমথম করছে, বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে বাহু ভাঁজ করা। আগে লক্ষ করিনি, ওর ডান হাতের আঙুলে শোভা পাচ্ছে প্রকাণ্ড এক হীরের আংটি। ওটা এতটাই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, কপালে হাত রেখে ছাউনি তৈরি করতে হলো আমার।

'আমার পিছন পিছন এসো।'

সাত

'না!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'না!'

'মুসা, মুসা, উঠে পড়ো।'

এক চোখ মেলে পিটপিট করে চাইলাম। সোফা বেডে শুয়ে আছি। মিস্টার ও মিসেস ল্যাম্পার্ড, মলি, এমনকী খুদে লরাও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে। তড়াক করে উঠে বসলাম। পিঠে অনুভব করলাম উষ্ণ রোদ। কেমন জানি বিভ্রান্ত, অপ্রস্তুত বোধ করছি।

'কঠিন দুঃস্বপ্ন দেখেছ মনে হচ্ছে,' মলি বলল।

'তুমি ভাল আছ তো, মুসা?' মিসেস ল্যাম্পার্ড প্রশ্ন করলেন। উদ্বেগ প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

মাথা ঝাঁকালাম। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অন্যের বাড়িতে কে চায় এরকম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে?

'নাস্তা খেতে এসো,' বললেন মিসেস ল্যাম্পার্ড। 'তোমরাও এসো।'

মলি গেল সবার শেষে।

'আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার, মুসা,' বলল ফিসফিস করে। 'হানাবাড়িতে হানা দেয়ার জন্যে একেবারে পারফেক্ট।'

গুঙিয়ে উঠলাম। ওকে বোঝাব কী করে যে দশটা বুনো ঘোড়াও আমাকে ১০০ মেইন স্ট্রীটে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না?

সিদ্ধান্ত নিলাম, বাবা-মা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর অজুহাত

দেখাব তারা বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না। কিন্তু মলি ভাল মেয়ে। ওকে ঠকাতে মন চাইল না। মুখ-টুখ ধুয়ে নতুন কাপড় পরলাম, সেঁটে নাস্তা করার পর মনটা খোশ হয়ে গেল।

আমার সাইকেলটা বাসায়। মলির সঙ্গে ওদের ড্রাইভওয়ের সামনে দেখা করব ঠিক করলাম। আমাদের গ্যারেজের উদ্দেশে এগোলাম। কম্বিনেশন লক চেপে দরজা খুললাম।

পা রাখলাম ভিতরে। বাইকের কাছে হেঁটে গিয়ে কিক স্ট্যান্ডে লাথি মারতে যাব, আচমকা খটাস করে লেগে গেল গ্যারেজের দরজা। এরকম হওয়ার তো কথা নয়! কালিগোলা অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

'ভড়কে গেছ, তাই না?' সেই কণ্ঠস্বর আবার!

হার্টকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক হাজির হয়ে গেছে সে।

'দেখুন, আপনি কিন্তু না বলে ঢুকেছেন আমাদের বাড়িতে। ভালয়-ভালয় চলে যান, নয়তো পুলিশ ডাকব।'

'আহাহা, বন্ধুর সাথে কেউ এভাবে কথা বলে? তোমাকে কতখানি সাহায্য করেছি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?'

'আমি মোটেই আপনার বন্ধু নই। আর আমি আপনার কাছে কখনোই কোনও সাহায্য চাইনি।'

'সাহায্য বন্ধ করতেও বলনি। আমার পরিশ্রমের ফসল ভোগ করছ তুমি। টিচারদের চোখের মণি হয়ে উঠেছ রাতারাতি।'

'কী চানটা কী আপনি? আমার কাগজ বিলির পয়সা? সরি, খরচ করে ফেলেছি।'

পুরো এক মিনিটের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল হার্ট। তারপর সিরিয়াস হয়ে উঠল।

'আমি তোমাদের খবরের কাগজের কম্পিউটারের গোপন কোড ব্যবহার করতে চাই।'

খাইছে, এসব কী বলছে বুড়ো? ঠিক শুনছি তো?

'কিন্তু কেন?'

'বলা যাবে না।'

'বলেন, বলবেন না। থাকগে, ওসব কোড-ফোড আমার জানা নেই। আমার কাজ শুধু কাগজ বিলি করা।'

'অফিসের বড় কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।'

'ওরা জানতে চাইবে কী দরকার আমার।'

'অজুহাত দিয়ে দেবে কিছু একটা। তুমি তো অজুহাত খাড়া করার ওস্তাদ।'

'মুসা! তুমি কি ভেতরে?' মলি এসে গেছে।

'এখুনি আসছি,' পাল্টা চেঁচালাম। তারপর হার্টের উদ্দেশে বললাম, 'যদি আপনার কথা না শুনি?'

'তোমার গ্রেড খারাপ হয়ে যাবে। বাবা-মা হতাশ হয়ে পড়বেন। গুজব ছড়াবে, তুমি একটা ঠগ– অন্যকে দিয়ে হোমওয়র্ক করাও।'

'বুঝেছি।' ঘামতে শুরু করেছি। 'কিন্তু আপনি নিজে কেন কোডটা জোগাড় করছেন না? আপনার তো অনেক ক্ষমতা।'

'পারলে কী আর তোমাকে বলতাম? ওটা আমার ক্ষমতার বাইরে।'

'গ্যারেজের দরজাটা খুলে দিন, প্লিজ।'

'আমার কথাগুলো ভেবে দেখো। অনেক কিছু নির্ভর করছে এর ওপর। আর একটা কথা মনে রেখো: আমি কিন্তু বন্ধু হিসেবে যতটা ভাল শত্রু হিসেবে ঠিক ততটাই ভয়ঙ্কর।'

আট

দরজা খুলে গেল। উষ্ণ রোদে ঝলমলিয়ে উঠল গ্যারেজ। হার্ট নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে দম নিলাম বুক ভরে।

'এত দেরি করলে যে?'

'সরি।' মলিকে কী বলব ভেবে পেলাম না। 'মলি, ও বাড়িতে গেলে কিন্তু বিপদ হতে পারে।'

'কেন? তুমি না বলেছ–'

'হ্যাঁ, কিন্তু কখন কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে?'

মলির মুখের চেহারায় এতটাই বিস্ময় ফুটল, গ্যারেজের ভিতরকার সমস্ত কথা ওকে খুলে বলতে হলো। শুনে তো খেপেই গেল ও।

'মুসা, তোমার উচিত পুলিশকে জানানো।'

'হ্যাঁ, ওরা তো আমার কথা বিশ্বাস করার জন্যে বসে আছে!'

'আমি যাব তোমার সাথে।'

'কী লাভ? হার্টকে একমাত্র আমিই দেখেছি। ওরা ভাববে মশকরা করছি আমি।'

'তা ঠিক। যাকগে, একজন পুলিশ অফিসারকে সাথে করে বাড়িটা থেকে ঘুরে আসলে কেমন হয়? পুলিশ দেখলে বুড়ো হার্ট হয়তো এ শহর ছেড়ে পালাবে।'

প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

'তবে, মলি, এটা নিয়ে কারও সাথে আলাপ করতে যেয়ো না। তাতে আমার বিপদ বাড়বে বই কমবে না।'

'ঠিক আছে। এবার চলো, থানায় যাই।'

দু'জনে থানায় গিয়ে পৌঁছলাম। বাইকে তালা দিলাম না।

এখান থেকে কে চুরি করবে আমাদের বাইক? ভিতরে প্রবেশ করে, মেইন ডেস্কের উদ্দেশে এগোলাম। ওখানে বসে অফিসার ওয়া ফোনে কথা বলছিলেন। রিসিভার রেখে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কী চাই।

ঢোক গিলে বলতে শুরু করলাম, 'আমরা একটা রিপোর্ট–' হঠাৎই জিভ জড়িয়ে এল, অফিসারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে।

মলি এসময় হস্তক্ষেপ করল।

'আমরা রিপোর্ট করতে এসেছি– উদ্ভট এক লোক সম্পর্কে।'

কপাল ঘষলেন অফিসার।

'কেউ তোমাদেরকে বিরক্ত করছে?'

কথাটা লুফে নিলাম আমি।

'শুধু আমাকে।'

'কী নাম তার?'

'বিল হার্ট।'

'চিনি বলে মনে হচ্ছে না।'

'শহরে নতুন এসেছে,' মলি বলল।

'তোমার সাথে কী করছে সে?'

মলি বলে উঠল, 'মুসার হোমওয়র্ক, টেস্ট...'

কনুইয়ের গুঁতো দিলাম। অফিসারের চোখজোড়া সরু হয়ে এসেছে। গতিক সুবিধের নয়। 'আমাকে হুমকি দিচ্ছে।'

'বাবা-মা কাউকে জানিয়েছ?, অভিযোগ করতে হলে বড় কাউকে

লাগবে।'

'ওর বাবা-মা শহরের বাইরে আছেন।'

'ও। এমুহূর্তে আমি বেশি কিছু করতে পারছি না। তবে মিস্টার হার্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেব। তার ঠিকানা জানো?'

খাইছে! এবার আসছে অবিশ্বাসের পালা।

'১০০ মেইন স্ট্রীট।'

'ওই পোড়োবাড়িটায় লোক এসেছে তা হলে। হুম। ঠিক আছে, আমরা চোখ-কান খোলা রাখব। আর হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু সাবধানে থাকবে।'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলাম। পুলিশে রিপোর্ট করে মনে একটু সাহস পাচ্ছি। বাইকে চড়তে যাব এসময় ভয়ঙ্কর চিন্তাটা মাথায় এল।

'এই, মলি, হার্ট যদি জেনে যায় আমরা এখানে এসেছিলাম? ও তো কীভাবে কীভাবে সবই জেনে ফেলে। খেপে গিয়ে যদি কিছু একটা করে বসে?'

'তা তো ঠিকই,' বলল মলি। 'আইডিয়া। একটু রিস্কি, তবে কাজ হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যায়।'

'বলো শুনি।'

'হার্টকে বলো কম্পিউটার কোড কীভাবে পেতে পারে ও।'

'কেন বলতে যাব?'

'ওকে বাড়ি থেকে বের করার জন্যে। ভিতরে ঢুকতে পারলে হয়তো ক্লু টু পেতে পারি আমরা। জানা যেতে পারে অনেক কিছু।'

'কী বলব ওকে?'

'সোজা। নিজেই একটা কোড বানাবে। পরে যখন ও পেপার সিস্টেমে ঢুকতে না পেরে অভিযোগ করবে, বলে দেবে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঠিক মত কোডটা টুকতে পারনি।'

'কিন্তু ও তো আমাকে জ্বালাতন করতেই থাকবে।'

'বলবে, কাগজের লোকটা মহা ব্যস্ত। তাকে বারবার বিরক্ত করলে চাকরি থাকবে না। অথচ চাকরিটা তোমার সাঙ্ঘাতিক দরকার।'

দেখা যাক, মলির বুদ্ধি কাজে লাগে কীনা। ব্যর্থ হলে মহা বিপদ হয়ে যেতে পারে।

নয়

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেছে। এক ঝোপের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছি মলি আর আমি, হার্টকে দেখছি বাড়ি ছেড়ে বেরোচ্ছে। এখন অবধি বেশ মসৃণভাবেই সব কিছু ঘটে চলেছে। হার্টের সদর দরজার তলা দিয়ে একটা চিরকুট ঢুকিয়ে দিই আমি, বেল টিপে, ও আমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই সাইকেলে চেপে হাওয়া হয়ে যাই।

হার্ট দৃষ্টিসীমার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমরা। এবার বাড়ির পিছনদিকের উদ্দেশে দৌড় দিলাম। দরজাটার কাছে এসে নবে মোচড় দিলাম। খোলা!

'বেআইনীভাবে অন্যের বাড়িতে ঢোকার জন্যে জেল খাটতে হবে না তো?' ফিসফিস করে বলল মলি।

'ভয় পেয়ো না। হার্ট নিজেই তো বেআইনী লোক।' নিঃশব্দে প্রবেশ করলাম আমরা।

জঘন্য দশা বাড়িটার ভিতরে। ছাদ থেকে ঝুলছে বড় বড় মাকড়সার জাল। হাতে গোনা যে কয়টা ফার্নিচার রয়েছে, তার উপরে পুরু ধুলোর আস্তরণ। বাতাসে বাসি, দম বন্ধ করা গন্ধ। জানালা খোলা হয়নি যেন বহু বছর। ভাগ্য ভাল, ফ্ল্যাশলাইট সঙ্গে এনেছিলাম। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।

আমরা এখন বাড়ির সামনের দিকে। কোনও সূত্র-টুত্র চোখে পড়েনি। লম্বা এক সার সিঁড়ি উঠে গেছে উপরতলায়। মলির দিকে চাইলাম। উঠব আমরা? মলির সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি আমি। ওর বাবা-মা খুবই ভাল ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে। ওর কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না... শিউরে উঠলাম ভাবনাটা মাথায় আসতেই।

মলি কনুইয়ের গুঁতো দিল আমাকে।

'ওটা স্টাডিরুম মনে হচ্ছে।'

ও ঠিকই বলেছে। একমাত্র ও জায়গাটাই বুড়ো ব্যবহার করে বলে মনে হলো আমার কাছে। চারধারে বইয়ের স্তূপ। তাক, বুককেস আর প্রকাণ্ড এক ডেস্কের উপরে বড় বড় মোমবাতি। সম্ভবত এখানেই বেশিরভাগ সময়

কাটায় হার্ট।

ডেস্কের কাছে চলে এলাম। মানুষের হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত এক বই উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তারমানে আমার সায়েন্স প্রজেক্টে সাহায্য করতে চায় হার্ট। ইতিহাসের উপর ইয়া মোটা এক বইও দেখতে পেলাম। নাহ, বুড়ো খাটছে আমার জন্য।

খাইছে, এসব কী ভাবছি আমি? ও তো আমাকে বশ করে ওর চামচা বানাতে চায়। আমার উপকারের জন্য তো কিছু করছে না।

কিন্তু আমাকে ও বেছে নিল কেন? উত্তরটা এখন আমি জানি। পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছিলাম, নিজেকে ফেলে দিয়েছিলাম ফাঁদে। ফাঁদে পড়া মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বেপরোয়া। তাকে দিয়ে সব কিছুই করানো সম্ভব। হ্যাঁ, ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছে হার্ট।

মলির কথায় সংবিৎ ফিরে পেলাম।

'এটা দেখো!' খোলা এক নোটবই দেখাল ও। প্রথম পাতায়, হার্টের প্রাচীন হস্তাক্ষরে লেখা, 'গ্রীনহিলস শাসনের পরিকল্পনা।' ওটা পড়ে মলির চাইতে কম চমকাইনি আমি।

বুড়োর কিছু একটা মতলব আছে জানতাম, কিন্তু তাই বলে তলে তলে এত?

পাতা উল্টে গেলাম নোটটার। হার্টের উদ্ভট পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা ধারণা পাচ্ছি: শহরের একমাত্র খবরের কাগজটার মাধ্যমে নাগরিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে সে। গোপনে কম্পিউটার ব্যবহার করে, সমস্ত আর্টিকল নিজের ইচ্ছে মত পরিবর্তন করবে, কোনও কোনওটা নতুন করে লিখবে। এভাবে পাঠকদের কাছে বিল হার্টকে উপস্থাপন করবে। এরপর ক্রমেই জোরাল হতে থাকবে তার বক্তব্য। সুযোগমত টিভি আর রেডিও সেন্টারও দখলে নিয়ে আসবে।

তার শাসন মেনে নিতে বলা হবে শহরবাসীকে। তার রাজত্বে নাকি বেকার থাকবে না, অপরাধী থাকবে না, মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। ব্যা-টা! পাগল আর কাকে বলে! একা একজন মানুষ, এভাবে কেউ কোনওদিন ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে?

'পড়াশোনা করা ভাল, মুসা। কিন্তু তাই বলে লোকের ব্যক্তিগত নোটবই?'

আমি চমকে উঠলাম কেন? হার্টের স্বভাবই তো যখন-তখন উদয়

হওয়া। হাত কাঁপছে, খসে পড়ে গেল নোটবইটা।

মলি চেষ্টা করেও আতঙ্কটা চাপা দিতে পারল না।

'ব্যক্তিগত? গ্রীনহিলস দখল করে নিয়ে শাসন করতে চান, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলো?' বলে উঠল ও।

'হ্যাঁ,' গলা মেলালাম আমি।

'এশহরটা আর সব শহরের চাইতে ভাল। কিন্তু এটাকে আরও ভাল করে গড়ে তোলা যায়। সেটাই চাইছি আমি। এরমধ্যে দোষটা কোথায়? আমার তো কারও ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই। আমার অধীনে সবাই সুখে থাকবে, একথা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

হার্টের কথায় প্রায় পটেই গিয়েছিলাম আমি। সত্যি বলতে কী, কথাগুলো শুনতে কিন্তু খারাপ নয়।

মলি আমার মনের কথা পড়ে ফেলল।

'তার বিনিময়ে কী দিতে হবে শহরের বাসিন্দাদেরকে?'

'বেশি কিছু না, শুধু আমার শাসন নিঃশর্তে মেনে নিতে হবে।' এবার আমার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'আমি কিন্তু তোমার আচরণে দুঃখ পেয়েছি, মুসা। তোমাকে বেছে নিয়েছিলাম আমাকে সাহায্য করার জন্যে। অথচ তুমি কিনা আমার প্ল্যান বানচাল করতে চাইছ! আমার এখন তোমাকে শেষ না করে উপায় নেই। এবং তোমার বান্ধবীকেও।'

দশ

হাত দুলিয়ে একটা আলোকিত মোমবাতি হাজির করল হার্ট। আমার ভীতি এখন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। মলির দিকে চাইলাম। দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে ওর।

'ওকে যেতে দিন। ও আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় করুন। শুধু ওকে ছেড়ে দিন, প্লিজ।' অনুনয় করে বললাম।

'তোমার মনোভাবের প্রশংসা করতেই হয়। আমি রীতিমত মুগ্ধ।' মলির দিকে চাইল পাগলা বুড়ো। 'আহারে, বেচারীর একদম কাঁচা বয়স। কিন্তু কী করব বলো, ও যে অনেক বেশি জেনে গেছে।' মুখের চেহারা কঠোর হলো

তার। 'এসো আমার সঙ্গে।'

আমাদেরকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে নেমে যেতে লাগল সরু এক সার সিঁড়ি ভেঙে। মলির হাত ধরলাম আমি। এর বেশি আর কীই বা করার আছে আমার।

হঠাৎই রাগ উঠে গেল। কোথায় পালাল ভয়-ভীতি! আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কে এই উন্মাদ বুড়োটা? নিজেকে কী মনে করে ও?

রাগের মাথায় কষে ফ্ল্যাশলাইটের বাড়ি মেরে বসলাম বুড়োর মাথায়। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না, সম্ভবত বুড়ো কিছু অনুভবই করেনি। অবিশ্বাস্য! জাদুকররা কি মানুষ নয়? যাকগে, হয়তো এ-ই ভাল হলো। ক্রুদ্ধ বুড়ো পাল্টা কী ব্যবস্থা নিত কে জানে, বাবা।

আমাদেরকে সেলারে নামিয়ে নিয়ে এল ও। আলকাতরা অন্ধকার। মলি মেঝেতে বসবে না কিছুতেই, বুড়োকে বলল চেয়ার এনে দিতে। আঙুল মটকাল বুড়ো, আর চোখের পলকে এসে গেল দুটো চেয়ার।

'আমাদেরকে নিয়ে কী করবেন আপনি?' প্রশ্ন করলাম। আগেভাগে জেনে রাখা ভাল। প্রস্তুত থাকতে পারব।

'চমৎকার প্রশ্ন, তবে এখন জবাবটা দেওয়া যাচ্ছে না। এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি কিনা। ভাবছিলাম তোমাদের দু'জনকে জিম্মি করব। তোমাদের বিনিময়ে শহরের ক্ষমতা হাতবদল করতে নিশ্চয়ই অরাজি হবে না ওরা?'

যাক, মেরে ফেলার চিন্তা অন্তত করছে না বুড়ো। হাতে সময় যত বেশি পাওয়া যাবে, পালানোর সুযোগও তত বেশি।

'কিন্তু আপনি কি এভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারবেন? দেশে আইন আছে, পুলিশ আছে...'

'থাকুক, আমি একদিনের জন্যে হলেও ক্ষমতা চাই,' উন্মাদের মত বলল বুড়ো

কার পাল্লায় পড়েছি আমরা! মনে মনে বললাম।

'কোনও কিছুর দরকার হলে চেঁচিয়ো। তবে কেউ উদ্ধার করতে আসবে এই আশা কোরো না।' খলখল করে হেসে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল হার্ট।

'সব দোষ আমার, মুসা। আমি দুখিত,' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল মলি।

'না, দোষ হার্টের। ও একটা শয়তান জাদুকর, ক্ষমতার মোহে অন্ধ। অ্যাই, মন খারাপ কোরো না। আমাদের বাবা-মা নিশ্চয়ই বসে থাকবে না,

শীঘ্রি খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। পুলিশে খবর দেবে। অফিসার ওয়া নিশ্চয়ই হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। তাঁরা হয়তো ইতিমধ্যে বুড়োর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করে দিয়েছেন।'

'এর মধ্যে অনেক হয়তো আছে।'

'না হয় ভাল দিকটাই দেখো। তোমার রিপোর্টের কাজে আসবে এমন অনেক কিছুই পেয়ে গেছ তুমি।'

'আমি এখন আর ও নিয়ে মোটেই ভাবছি না।'

'ভাবা উচিত।'

'ঠাট্টা করছ? আমরা মস্ত বিপদে পড়েছি, মুসা।'

'আচ্ছা, তুমি তো রিপোর্ট তৈরির জন্যে অনেক পড়াশোনা করেছ। পাগল জাদুকরকে খুন করার মত কিছু কি পেয়েছ?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিল মলি।

'না। তবে একটা সিনেমার কথা মনে পড়ছে। একটা ডাইনীর গায়ে এক বালতি পানি ছুঁড়ে দেয়ার পর সে কুঁচকাতে কুঁচকাতে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওতে কাজ হতে পারে।'

গতরাতের কথা মনে পড়ল। হার্ট তখন আমার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে। ঝড় শুরু হওয়ার পর ও চলে যায়।

'এত সোজা না-ও হতে পারে, তবে চেষ্টা করে দেখা যায়।'

'সোজা কোথায়? এখানে পানি আছে কিনা সন্দেহ।'

ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললাম। উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগলাম ঘরময়। দুঃস্বপ্নে দেখা কারাগারে আটকা পড়েছি যেন।

ঘুরে দাঁড়ালাম বোঁ করে।

কারা যেন ডাকল আমার নাম ধরে। কান পাতলাম। হ্যাঁ! অবিশ্বাস্য! ওরা এসে পড়েছে– আমার প্রিয় দুই বন্ধু। আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে!

'আমরা নীচে আছি, কিশোর, রবিন! সেলারে!' চেঁচালাম আমি। এখন আর ভয় করে লাভ কী? আমাদের জীবন হুমকির মুখে। শুধু কি তাই? গোটা শহরের উপর চরম বিপদ নেমে আসতে পারে।

কিশোরের কণ্ঠস্বর কাছিয়ে এল।

'আমি জানি তুমি কোথায়। সাহস রাখো। আমরা তোমাকে ঠিক বের করে আনব।'

অদ্ভুত কাণ্ড– কিশোর আর রবিন কোত্থেকে চলে এল! আমি তো স্বপ্নেও

এমনটা ভাবিনি।

মলি ওদেরকে চেনে। আমাদের ড্রাইভওয়েতে পরিচয় হয়েছিল।

গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর আর নথি বিশেষজ্ঞ রবিন। একসঙ্গে বহুবার বিপদে পড়েছি, আবার উদ্ধারও পেয়েছি। আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কেউ যদি করতে পারে তো ওরাই পারবে।

মলি আর আমি অপেক্ষা করছি। মনে হচ্ছে কয়েক যুগ পেরিয়ে গেল বুঝি। এসময় খুলে গেল সেলারের দরজা। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এল প্রায়, যখন দেখলাম কিশোর আর রবিনকে ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে পাগলা বুড়ো।

এগারো

ওদের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো, হর-হামেশাই বুঝি ওরা পাগল জাদুকরের কবলে পড়ে। কিশোরের হাতে কমলার রসের গেলাস। একটুখানি চলকে পড়ল।

'তোমাদের সঙ্গী জুটেছে,' বলল হার্ট। ব্যাপারটা রীতিমত উপভোগ করছে সে। 'এদের দু'জনকে আমার উঠানে ছোঁক-ছোঁক করতে দেখে ধরে এনেছি।'

হাতের কাছে কিছু পেলে ঠিক ছুঁড়ে মারতাম। তুই, ব্যাটা, উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস। তোর উঠান কবে থেকে হলো?

'এটাকে নিজের বাড়ি মনে কোরো, বাছারা। হাতে অনেক কাজ, নইলে তোমাদের সাথে বসে খানিক গল্প করা যেত।' তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ও। বুড়ো দূর হওয়ায় ভীষণ খুশি হলাম আমি।

আমার আর মলির দিকে চেয়ে হাসল কিশোর আর রবিন। যে পরিস্থিতিতেই হোক, ওদেরকে দেখতে পাওয়াটা দারুণ ব্যাপার।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে,' আমার উদ্দেশে বলল কিশোর। 'বুড়ো আস্ত পাগল একটা!' ও অবিকল হার্টের নকল করে দেখালে হেসে উঠলাম সবাই। এবার বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলালাম।

'আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। তোমরা এখানে কী করছ?' জিজ্ঞেস

করলাম।

'একই প্রশ্ন তো আমাদেরও। আজ সকালে ফিরে এসেছি আমরা। তোমার বাসায় ফোন করলাম, কেউ ধরল না। তখন আমরা ছুটে গেলাম তোমার ওখানে। গিয়ে দেখি আঙ্কল-আন্টি মাত্র ফিরেছেন। তাঁরা বললেন তুমি মলিদের বাসায়। গেলাম সেখানে। মলির মা জানালেন তোমরা বাইক নিয়ে বেরিয়েছ। খানিকটা চিন্তিত মনে হলো তাঁকে,' বলল কিশোর।

তারপর দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে এখানে চলে এসেছে ওরা।

'এখন প্রথম কাজ হচ্ছে, এখান থেকে পালানো। কোনও আইডিয়া?' প্রশ্ন করলাম।

'আমরা সংখ্যায় বেশি। এটাকে কাজে লাগাতে হবে,' বলল রবিন।

'ওর ক্ষমতা আরও বেশি। ভুলে যেয়ো না, ও জাদুকর, তা ছাড়া বদ্ধ উন্মাদ,' বলল মলি।

'ওই বিশ্রী জানালাটা ভেঙে ফেলি এসো,' প্রস্তাব করলাম আমি। 'ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে কাজটা করা যেতে পারে।'

'শব্দ হবে। ট্র্যাপ ডোর আছে কিনা খুঁজে দেখি বরং,' বলল কিশোর। 'হয়তো আছে, হার্ট জানে না।'

পরমুহূর্তে তল্লাশী শুরু করলাম আমরা। লজ্জিত বোধ করছি আমি। আমার জন্যই সবাই মিলে এখন বিপদের মধ্যে পড়েছে। কী দরকার ছিল আমার ওদেরকে হার্টের কথা জানাতে যাওয়ার? বুড়োর সঙ্গে বোঝাপড়া যা করার আমিই না হয় করতাম। যাকগে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন আমার দায়িত্ব, বন্ধুদেরকে নিয়ে এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া।

বুড়ো কিশোর আর রবিনকে এখানে নামানোর পর সেলারের দরজা লাগিয়েছিল? ওকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। শ্বাস চেপে রেখে, সন্তর্পণে সিঁড়ির মাথায় উঠে এলাম। দরজার নব ঘোরালাম। বন্ধ, তবে কব্জাগুলোকে ততটা শক্ত মনে হলো না। হয়তো আলগা করা যাবে।

শব্দ হতে পারে, এই ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে চাইলাম না। তার বদলে, বন্ধুদেরকে ফিসফিসিয়ে বললাম, বল্টু খোলার মত কিছু একটা পায় কিনা খুঁজে দেখতে। খুঁজল ওরা, কিন্তু তেমন কিছু পাওয়া গেল না।

এ দিকে রবিনের চোখে পড়েছে, ফাটা এক পাইপ বেয়ে টপ-টপ করে পানি ঝরছে।

'পানিটা ধরে রাখা দরকার,' বলল ও। 'হয়তো খাওয়া যাবে না, কিন্তু অন্য কাজে লাগতে পারে।'

একটা ভাঙাচোরা বালতি খুঁজে পেয়ে মলির হাতে দিলাম।

'পানি থিয়োরি প্রয়োগ করে দেখা যাক, কাজ হয় কী না,' নেমে এসে বললাম ঠাট্টা করে।

পাইপের নীচে বালতিটা রাখল মলি। টিনের উপর পানি পড়ার শব্দ জোরাল হয়ে উঠলে, একটা ছেঁড়া কম্বল দিয়ে বালতির তলা মুড়ে দিল। শব্দ থামলেও পানি জমতে এখন সময় নেবে। কেননা, কম্বল শুষে নিচ্ছে পানি। কিন্তু মলির বিষণ্ন মুখের চেহারা আমাকে বিচলিত করে তুলল। ও কী ভাবছে বুঝতে বেগ পেতে হলো না: আমরা কি আদৌ কোনওদিন বেরোতে পারব এখান থেকে?

চরম হতাশায় কাঠের এক বীমে কষে লাথি ঝাড়লাম আমি। জিনিসটা এতটাই প্রাচীন, গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল থরথর করে। খাইছে! একটু পরেই দেখি হন্তদন্ত হয়ে হার্ট এসে হাজির। খেপে আগুন।

'তোমরা কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছ। তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার এই ফল?'

'ভাল ব্যবহার–?' জীবনে এত অবাক হইনি আমি। রেগে গিয়েছি ভীষণ।

'এখন আর মাফ চেয়ে কাজ হবে না,' বাধা দিয়ে বলল হার্ট। 'আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।' আমার উদ্দেশে চোখ টিপল বুড়ো।

খাইছে! বুঝে গেছি এরপর কী ঘটতে চলেছে। হাত দোলাল ও, পরমুহূর্তে হাতে এসে গেল লম্বা এক দড়ি। এবার তর্জনী উল্টে, বাংলা ছবির ভিলেনের মত কাছে ডাকল মলিকে। বেচারী ভয়ে আধমরা। আমার পিছনে আড়াল নিল।

'আমি আগেও বলেছি, হার্ট। ওকে ছেড়ে দিন।'

'কেন বুঝতে পারছ না, আমি চাইলে অনেক আগেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারতাম। এই খাম্বার সাথে তোমাদের বেঁধে রাখব। তোমাদের ভালর জন্যই। তা হলে আর কোনও বিপদ-আপদ হবে না তোমাদের।' দু'পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মলির উদ্দেশে। 'এসো, বাছা।'

বিস্ফোরণ কাছিয়ে এসেছে আমার দিকে। এক হাতে তখনও কমলার রস শক্ত করে ধরা, অপর হাত বাড়াল আমার কাছ থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নেওয়ার

জন্য। বুঝলাম, বুড়োর মাথায় বাড়ি মারতে চায়। কিন্তু ওতে যে কাজ হবে না মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

তার বদলে আরও শক্ত করে ধরে থাকলাম ফ্ল্যাশলাইটটা। ও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ওটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল। তার ফল হলো এই, বুড়ো হার্টের সারা শরীরে চলকে পড়ল কিশোরের কমলার রস।

নড়বারও সাহস পেলাম না আমরা। তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে আশঙ্কা করেছিলাম, ভাবিনি অমন তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পাব।

হার্ট বুড়ো গর্জাচ্ছে আর যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

'বাঁচাও,' কোনমতে আওড়াতে পারল। 'আমার চামড়া পুড়ে যাচ্ছে আ-গু-নে।'

আগুনের শিখা নেই, কিন্তু মৃদু ফট-ফট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। নাকে এল মাংস পোড়া গন্ধ।

এবার আমাদের চোখের সামনে, ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে শুরু করল খেপা জাদুকর। খাইছে!

'অ্যাসিড!' আর্তনাদ ছাড়ল। 'অ্যাসিডে আমার মাংস পুড়িয়ে দিচ্ছে!'

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। আমরা চারজন নির্বাক দাঁড়িয়ে দেখছি। এক চুল নড়ার সাধ্য নেই।

শেষমেশ কিশোর খালি গেলাসটার লেবেল পরীক্ষা করে দেখল।

'কমলার রসে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড আছে। হার্টের শরীরটা সাধারণ মানুষের মত ছিল না। যে কারণে পুড়ে গেছে কমলার রসে,' ব্যাখ্যা দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।

'আর কিছু ঘটার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। জানালাটা কোথায়?'

নোংরা জানালাটার নীচে পড়ে থাকা জিনিসপত্র সরালাম আমরা। জাদুবলে হাজির করা হার্টের চেয়ার দুটো টেনে আনতে চাইলাম। কিন্তু ও দুটো এমনভাবে কাঁপতে লাগল, এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে হিঁচড়ে নেওয়া হচ্ছে যেন।

মেঝের উপর আলো ফেললাম ফ্ল্যাশলাইটের। লক্ষ করলাম, চেয়ার দুটো দাঁড়িয়ে প্রাচীন এক কবর ফলকের উপর।

ওটার পাশে বসে পড়লাম হাঁটু গেড়ে। দেখতে পেলাম গ্র্যানিটে লেখা রয়েছে: এখানে ঘুমন্ত বিল হার্টের অনন্ত আত্মা। কোনও তারিখ নেই, নেই

কোনও প্রিয়জনের ভালবাসার বাণী।

হার্ট কি জাদুকর ছিল? ওকি এখানে বাস করত? নাকি ও অন্য কোনও বিল হার্টের বংশধর? নাকি ও এই মৃত ব্যক্তির নাম নিয়েছিল বিশেষ কোনও কারণে? এসব প্রশ্নের জবাব জানা যাবে না আর কোনওদিনই।

রবিন আর মলি একটা চেয়ার শক্ত করে ধরে থাকল, আর কিশোর খুঁজে নিল জানালাটার ছিটকিনি।

অবাক কাণ্ড, ছিটকিনি খোলাই ছিল। অব্যবহৃত পড়ে থাকায় এঁটে গিয়েছিল। খানিক চেষ্টা-চরিত্র করার পর অবশেষে খোলা গেল।

মলি বেরোল সবার আগে। তারপর রবিন আর কিশোর। আমার পালা এলে, হার্ট শেষ বার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে হেঁটে গেলাম– তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম ওর দেহাবশেষ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কিছু নেই। কিচ্ছুই না।

কে বলবে জলজ্যান্ত এক অস্তিত্ব এই খানিক আগেও এখানে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছিল?

বারো

হয়তো হার্টের মত অপার্থিব আত্মার মৃত্যু নেই। হয়তো অন্য ধরনের কোন জীবনে আবারও জন্ম নেবে সে।

এত কিছুর পরেও, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে মোটেও দুঃখিত নই আমি। ও আমাকে সচেতন করে তুলেছে অন্য এক ভুবন সম্পর্কে।

ও কি সত্যি সত্যি আমাদের ক্ষতি করত?

আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, ও নিজের মত করে শাসন করতে চেয়েছিল গ্রীনহিলসের মত ছোট্ট এক শহর। জায়গাটা সুন্দর, এখানকার বাসিন্দারাও ভাল।

হার্টের উদ্দেশ্য হয়তো ভাল ছিল, কিন্তু যে পন্থা ও নিয়েছিল সেটা ঠিক ছিল না।

ভুল তো মানুষও করে, তাই না?

হার্ট হয়তো শহরসুদ্ধ মানুষের মনোযোগ আর শ্রদ্ধা আশা করেছিল।

এরকম মানুষ কি দুনিয়াতে নেই? আছে, অগুনতি। পিছু ফিরে চাইলে, উপলব্ধি করি ও আমার উপর অতটা খেপে গিয়েছিল কেন।

আমি আসলে ওর স্বপ্ন ভেঙে খানখান করে দিয়েছিলাম। আমাকে পাশে চেয়েছিল ও। কিন্তু আমি করেছি শত্রুতা।

হার্টের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রেখেছি আমি। ও বলত, 'জ্ঞানই শক্তি।'

ওর কাছে শক্তিটাই ছিল মূলমন্ত্র। তবে ওর কথার আরেকটা অর্থও আছে। ও আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হয়– শিক্ষা মানুষের জীবনে অত্যন্ত জরুরী এক বিষয়।

আমার সাবেক প্রতিপক্ষকে সম্মান জানাতে গিয়ে এখন পড়াশোনায় মন দিয়েছি আমি। সাধ্যমত চেষ্টা করছি শিক্ষকদের খুশি করতে।

আমি, মুসা আমান, এখনও দুনিয়ার সেরা ছাত্র নই। কিন্তু খেপা জাদুকরকে ধন্যবাদ, আমি এখন ছাত্র হিসেবে আগের চাইতে অনেকই ভাল।

***